Advanced International Journal of Multidisciplinary Research

E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com

Volume 4, Issue 6, November-December 2026

CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i06.1585

সাঁওতালি সাহিত্যে পৃথিবী ও মানুষ সৃষ্টির ধারণা: *হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা* পুস্তকের আলোকে

Mr. Raju Mardi[1], Dr. Naran Tudu[2]

[1]**Ph.D. Scholar**, Department of Santali, Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) Deemed to be University, Bhubaneswar, Odisha

[2]**Assistant Professor,** Department of Santali, Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) Deemed to be University, Bhubaneswar, Odisha

সারসংক্ষেপ :-

ভারত একটি বহুভাষিক দেশ,এখানে অনেক ভাষা রয়েছে। যেমন—হিন্দি, বাংলা, ওড়িয়া, তেলুগু, অসমীয়া ও সাঁওতালি। এর মধ্যে সাঁওতালি একটি প্রাচীন ভাষা। সাঁওতালি বলতে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ভাষাকে বোঝায়। সাঁওতালরা এই ভাষায় সাহিত্যচর্চা করে থাকেন। ভাষাবিদদের মতে, সাঁওতালরা প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড (Proto-Australoid) জনগোষ্ঠীর বংশধর। সাঁওতালি ভাষাকে অস্ট্রো-এশীয় (Austro-Asiatic) ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাঁওতালি সাহিত্যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনা নিয়ে মৌখিকভাবে প্রচলিত ছড়া, গান, ব্রতকথা এবং রূপকথাগুলোকে সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে—যা লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। সাঁওতাল সমাজে লোকসাহিত্যের প্রতি গভীর আস্থা থাকায় লিখিত সাহিত্যের দিকে তাদের ঝোঁক খুব একটা ছিল না। তবে বর্তমানে শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে সাঁওতাল সমাজে লেখালেখির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সাঁওতালদের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, বিভিন্ন সামাজিক প্রথা ও রীতি-নীতি, সৃষ্টিতত্ত্ব এবং তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক যাবতীয় তথ্য অত্যন্ত যত্নসহকারে সংগ্রহ করে 'বেনাগড়িয়া মিশন প্রেস' (Benagadia Mission Press) থেকে একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সাঁওতাল জনজীবনে প্রচলিত প্রথা ও ঐতিহ্যগুলো কোলয়ান হাড়াম আর জুগিয়া হাড়াম -এর মতো ব্যক্তিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে রোমান লিপিতে এই '*হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা*', গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন রেভারেন্ড লারস অলসেন স্ক্রেফসরুড (Rev. L. O. Skrefsrud) এক বিদেশী মিশনারি সাহেব। এই নিবন্ধে '***হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা***' এর ওপর ভিত্তি করে সাঁওতাল সমাজের সৃষ্টিতত্ত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

সূচক শব্দ :- সাঁওতালি ভাষা, সাঁওতালি সাহিত্য, এল. ও. স্ক্রেফসরুড , হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা, পৃথিবী ও মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব ।

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research

E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com

Volume 4, Issue 6, November-December 2026

CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i06.1585

ভূমিকা :-

এই পৃথিবীতে যেমন অনেকগুলো দেশ আছে, সেই সব দেশে অনেক গুলো প্রজাতির মানুষ বসবাস করে। সেই সব মানুষের নিজেদের মধ্যে আদান প্রদানের জন্য ভাষা আছে। এর মাধ্যমে মানুষ একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে, চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশ করে এবং সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করে। এই মহাবিশ্বে "সাল ১৯৮৬ তে গোটা দেশের মানুষের জনসংখ্যা ছিল ৩ আরব এর কাছাকাছি। ভাষা বিজ্ঞিনীদের অনুমান অনুসারে বিশ্বে সমস্ত ভাষার সংখ্যা ৪০০০ থেকে ৮০০০ এর মধ্যে আছে। তাদের মধ্যে সবথেকে বেশি কথা বলার ভাষা হচ্ছে মান্দারিন চিনি, ইংরাজি,হিন্দি, স্পেনিশ, রুসি, আরবি, বাংলা, পুতুগাল,মেলে ইন্দোনেশিয়ান, জাপানী, জার্মানি, আর ফ্রাঞ্চ।,,[১] সান্তালি ভাষা আগ্নেয় ভাষা বা অস্ট্রিক পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। আগ্নেয় ভাষা পরিবারের ভাষা ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে সবথেকে বেশি মানুষ কথা বলে। এই ভাষা পরিবারের বসতি হচ্ছে ভারতের বিহার,পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, এবং আসাম রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে । সাঁওতালি ভাষাকে আগ্নেয় ভাষায় রাখা হয় কারণ এটি ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে ব্যবহৃত হয় বলে একে প্রটো-অস্ট্রোলায়েড নামে রাখা হয়। ভারত ছাড়া নেপাল, বাংলাদেশ, মরিশাস, ত্রিনীদাদ দেশে অস্ট্রিক ভাষা পরিবারের বিস্তার রয়েছে। ২০১১ সালের ভারতীয় আদমশুমারি অনুসারে ৭,৩৬৮,১৯২ জন সাঁওতালি ভাষাভাষী ছিলেন। এই পরিসংখ্যানে করমালি এবং মাহালির মতো সম্পর্কিত উপভাষার বক্তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সাঁওতালিকে ভারতের একটি তফসিলি ভাষা হিসাবে স্থান দেয়, যা মূলত ঝাড়খন্ড, পছিমবঙ্গ এবং ওড়িশার মতো রাজ্যে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকেরা কথ্য।

লেখার উদ্দেশ্য :-

এই গবেষণা প্রবন্ধ দ্বারা সাঁওতালী সাহিত্যর উদ্ধভব সমন্ধে জানা যাবে । এই প্রবন্ধ দ্বারা সাঁওতাল জনজাতির কোন বসবাস সমন্ধে জানা।এই প্রবন্ধ দ্বারা সাঁওতাল জনজাতির বিশ্বাস পৃথিবী সৃষ্টি ও এই পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ও বংশ বিস্তার ও তাদের গোত্র বিভাজন সমন্ধে জানা যাবে। আধুনিক প্রজন্মের কাছে সাঁওতালী ও তাদের সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরা তার সাথে এই মৌখিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বোঝান। এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য হলো '*হড় করেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ* কাথা' গ্রন্থের আলোকে সাঁওতালি সমাজে প্রচলিত পৃথিবী ও মানুষ সৃষ্টির ধারণা বিশ্লেষণ করা এবং এর মাধ্যমে সাঁওতালি লোকবিশ্বাস জীবনদর্শন ও মৌখিক সাহিত্য-ঐতিহ্যের স্বরূপ ও তাৎপর্য তুলে ধরা।

গবেষণা পদ্ধতি :-

এই প্রবন্ধটি মূলত গুণগত (Qualitative) গবেষণাপদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে । প্রবন্ধের প্রধান তথ্যসূত্র হিসেবে 'হড় করেন মারে হাপড়ামকো রেয়াগ কাথা' গ্রন্থটি ব্যবহার করা হয়েছে। তার পাশাপাশি সাঁওতালি লোকসাহিত্য, লোককথা, পুরাণ, মৌখিক ঐতিহ্য এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (Content Analysis) পদ্ধতির মাধ্যমে পৃথিবী ও মানুষ সৃষ্টির ধারণা, প্রকৃতিচেতনা, সামাজিক বিশ্বাস এবং সাঁওতাল সমাজের জীবনদর্শন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় গ্রন্থে বর্ণিত সৃষ্টি-কাহিনির অন্তর্নিহিত সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক তাৎপর্য

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 6, November-December 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i06.1585

অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। একই সঙ্গে সৃষ্টি-কাহিনির মধ্য দিয়ে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে তুলনামূলক ও ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতির সাহায্যে সাঁওতালি সৃষ্টি-চিন্তার স্বাতন্ত্র্যও তুলে ধরা হয়েছে।

সাহিত্যেক পর্যালোচনা :-

এই গবেষণা প্রেক্ষাপটে **হড় কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা** পুস্তকটি সাঁওতাল সমাজের প্রাচীন সৃষ্টি ও পূর্বপুরুষ সম্পর্কিত কাহিনি জানার ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়েছে। এখানে হাপড়াম বা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সাঁওতাল সমাজের পূর্বপুরুষদের স্মরণ ও তাদের প্রতি শ্রদ্ধা আর সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

১. ধারতি সিরজন আর মানওয়া জানাম রেয়াঃ কাথা Santal Mythology: The Creation of the World and the Human Being By Boro Baski Illustrated by Sanyasi Lohar

২. হেম্ব্রম ,পরিমল,সাঁওতালি সাহিত্যের ইতিহাস , নির্মল বুক এজেন্সি, কোলকাতা

৩. মুরমু, রামেশ্বর (আদিম সান্তাড়), জাহের বোঙ্গা সান্তাড় কো, ঔদিম পাবলিকেশন -কোলকাতা

সাঁওতালি সাহিত্য :-

মনোবিজ্ঞানিদের কথায়, মানুষ নিজেদেরকে প্রধান দুটি ধারাই প্রকাশ করেছে। একটি তাহার কর্মের জগৎ আর অন্যটি হচ্ছে সাহিত্যের জগৎ। কর্মের ক্ষেত্রে মানুষ তাহার সমস্ত চেষ্টা দিয়ে পরিবার ও সমাজ প্রভৃতি গড়ে তুলেছে আর সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার গভীর অন্তরের দুঃখ ও আনন্দকে প্রকাশ করেছে। তাই সমাজ ও সাহিত্য একই জায়গা থেকে উৎস। "অনেকে বলেন , সাহিত্য সমাজের আরশি(দর্পণ) । কথাটা সত্যি হলেও সর্বাংশে সত্যি নয়, কেন না সমাজে যা ঘটে তার প্রতিফলন সাহিত্যে ঘটলেও সাহিত্য আমাদের অনেক কিছু দেয়। একদিকে যেমন আনান্দ দেয় তেমনি মানব জীবনের বিছিত্র রূপ, সমাজে কি ঘটতে পারে, তার প্রতিক্রিয়া ইত্যাদিও প্রতিফলিত হয় ।,,[২] প্রতিটি ভাষার সাহিত্য গড়ে উঠেছে সেই ভাষাভাষী জনজাতির সমাজ-সংস্কৃতি জীবনযাপন নিয়ে। সাহিত্যে সেই ভাষাভাষী মানুষের প্রতিদিনের জীবনচিত্রকে খুঁজে পাওয়া যায় । সাঁওতালি সাহিত্য গড়ে উঠেছে সাঁওতাল জনজাতির দৈনন্দিন জীবনচিত্র, সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে। "এই সাহিত্যের মাধ্যমে খুঁজে পাওয়া যায় মানবজীবনের চিরন্তন আবেদন যা দেশকাল পাত্র ছাড়িয়ে বিশ্বময় হয়ে উঠেছে । কিন্তু এহেন সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি।,,[৩]

সাঁওতালি সাহিত্যের ইতিহাসকে খিস্টাব্দের হিসাবে ভাগ করা খুব কঠিন । তবু তর্কের খাতিরে সাঁওতালি মৌখিক সাহিত্যকে আদিযুগ বলে ধরা হয় । সান্তালি সাহিত্যের লেখক প্রোফেসর কৃষ্ণচন্দ্র টুডুর হিসাবে "সাল ১৮৫৪ সালের পূর্ব কালকে আদিকাল অর্থাৎ হোড় অবতার বা লোক যুগ কা সাহিত্য বলাহয়। সাল ১৮৫৪ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত কালকে মধ্যকাল হিসাবে ধরেছেন। এবং ১৯৪৭ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত কালকে আধুনিক কাল হিসাবে বলেছেন।,,[৪] আবার সান্তালি সাহিত্যের লেখক পরিমল হেমব্রম এর কথাই সাঁওতালি সাহিত্যের ধারাবাহিকতাকে বা ইতিহাসকে তিনটি পর্বে ভাগ করেছেন। (১) মৌখিক সাহিত্য । (২) মিশনারিদের অবদান বা সংগৃহীত সাহিত্য (৩) সাঁওতালদের সচেষ্টায় লিখিত সাহিত্যের ধারা । সাঁওতাল সমাজের মানুষরা প্রথম দিকে লোক সাহিতের উপরে বেশি জোর দিতেন বা বিশ্বাস করতেন। সাঁওতালিতে

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 6, November-December 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i06.1585

একটা কথা আছে –'অল খন দ থুতি গে সরেসা' অর্থাৎ লেখার থেকে শ্রুতিই শ্রেস্ট । এই মানসিকতার জন্যই হয়তো সাঁওতালি সাহিত্য বহুকাল থেকে শ্রুতির আকারে ব্যাবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমানে সাঁওতালি সাহিতের অনেকটা উন্নতির দিকে এগিয়ে আসছে। সাঁওতাল সমাজের অনেক লেখক লেখিকা তাদের সচেষ্টায় অনেক ছড়ার বই, গল্পের বই, উপন্যাস, প্রবন্ধ, পত্রিকার লেখা লেখিতে অনেকটায় এগিয়ে এসেছে ।

হড় করেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা ঃ-

এই 'হড় করেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা' পুস্তকটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল রোমান হরপে সাল ছিল ১৮৮৭ সালে। এই পুস্তকে যেসব লেখা আছে সেইসব সাঁওতাল সমাজের একজন গুণীজন ব্যক্তি যাকে কলেয়ান গুরু নামে পরিচিত । নরওয়ে দেশ থেকে আগত একজন মিশনারি স্ক্রেফসরুড সাহেব তিনি কলেয়ান গুরুর শুতি কথাগুলো খুব যত্নের সাথে জোগাড় করে পুস্তকের আকরে সেটি প্রকাশ করেন। সাঁওতাল জনজীবনে প্রচলিত রীতিনীতি সংক্রান্ত বিষয়কে কোলয়ান গুরু বা অনেকে (কোলয়ান হাড়াম) এর কাছে থেকে সংগ্রহ করে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন রোমান হরফে। "অনেকে মনে করেন, স্ক্রেফসরুড সাহেব সাঁওতালদের রীতি রেওয়াজ বিষয়ক অপর এক পন্ডিত মানুষ জুগিয়া হাড়ামের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।,,[৫] এই গ্রন্থে সাঁওতাল জাতির জন্ম - মৃত্যু এবং বিবাহ এর সঙ্গে সম্পকিত নানান সামাজিক রীতিনীতি, এদের সৃষ্টি কাহিনী, সমাজ-সংস্কৃতি যাবতীয় তথ্য যত্ন সহকারে সংগ্রহ করে একটি মূল্যবান গ্রন্থের প্রকাশ করেন বেনাগড়িয়া মিশন প্রেস থেকে (ঝাড়খন্ড রাজ্যের দুমকা জেলায় অবস্থিত)। স্ক্রেফসরুড সাহেবের পুরো নাম রেভারেন্ড লারস অলসেন স্ক্রেফসরুড(Rev. L. O. Skrefsrud) ১৮৪০ খিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারী নরওয়ে দেশে জন্মগ্রহন করেন । স্ক্রেফসরুড সাহেবের অকৃত্রিম সাঁওতালি প্রীতির কারনে সাঁওতালরা তাকে বলত -কেরাপ সাহেব। নরদান ইভানজেলিক্যাল চার্চ মিশনের মিশনারি ছিলেন। তৎকালীন বিহার রাজ্যের সাঁওতাল পরগণা জেলার বেনাগড়িয়ায় ১৮৬৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর একটি মিশন স্তাপিত করেন, যার নাম বেনাগড়িয়া মিশন । এই মিশন প্রতিষ্ঠার পিছনে যার অবদান সব থেকে বেশি তিনি স্ক্রেফসরুড সাহেব , অন্য দুজন হলেন- (১)জনসন সাহেব যার পুরো নাম এডওয়ার্ড. সি. জনসন (2) পাপা সাহেব বা যার পুরো নাম রেভারেন্ড এইচ পি বোরেসন । তার অমায়িক ব্যাবহারের জন্য সাঁওতালরা তাকে পাপা সাহেব বলে ডাকত। সাঁওতালি সাহিত্যের বিকাশে বিদেশি খিস্টান মিশনারি দের অবদান অনেক। তারা অনেক পুস্তক সাঁওতালি সাহিত্যকে উপহার দিয়েছেন। সাঁওতালি সাহিত্যরে ব্যাকরণ তারা রোমান হরফে তারাই প্রথম লিপিবদ্ধ করেন। মূল কথাই বলাযায় সাঁওতালি সাহিত্যের লেখা সাহিত্য তাদের দ্বারায় সূচনা হয়েছে।

পৃথিবী ও মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব :-

সূর্য উদয় হবার দিকটা হচ্ছে মানুষের জন্ম । পূর্বে এই গোটা পৃথিবীতে জলমগ্ন ছিল । এই জলমগ্ন পৃথিবীর জলের তলায় ছিল মাটি । তারপরে ঠাকুর বা বাবা ঈশ্বর জলের জীবজন্তু সৃষ্টি করলেন প্রথমে সৃষ্টি করলেন কাঁকড়া তারপরে একে একে মাগুর মাছ, কুমির, তিমি মাছ, চিংড়ি মাছ, কেঁচো আর কচ্ছপ ইত্যাদি সৃষ্টি করলেন। তারপরে ঈশ্বর ভাবলেন আর কাকে তৈরি করা যায় ? তিনি মনোনিবেশ করলেন মানুষ তৈরি

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research

E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com

Volume 4, Issue 6, November-December 2026

CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i06.1585

করা যাক। তারপর তিনি মাটি দিয়ে মানুষ তৈরি করলেন। মানুষ তৈরি হবার পর তিনি তাদের প্রাণ দিলেন । প্রাণ দেওয়ার পরে আকাশ থেকে উড়ন্ত ঘোড়া এসে তাদের মাড়িয়ে দিয়ে চলে গেলেন । এতে বাবা ঈশ্বরের বা ঠাকুর এর মনে অনেক দুঃখও হল।

তারপর বাবা ঈশ্বর মনোনিবেশ করলেন আর মাটি দিয়ে মানুষ বানাবেন না, তিনি পাখি সৃষ্টি করবেন। তারপর তিনি হাঁস ও হাঁসিল নামে দুইটি পাখি সৃষ্টি করলেন তিনি এই দুইটি পাখি তিনি তার বুকের বা শরীরের ময়লা দিয়ে তিনি পাখি সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি পাখি সৃষ্টি করার পরে তিনি তার হাতে রেখে পাখিটিকে ভালভাবে দেখলেন খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে। তারপর তিনি তাদের ফুঁ দিলেন সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রান পেলেন । প্রান পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই পাখি দুটি ফুড়ুৎ করে আকাশের দিকে উড়ে পালালেন। তার পরে সেই পাখি দুইটি গোটা চারিপাশে উড়ে বেড়ায় । তারা উড়ে উড়ে গোটা ঘুরে বেড়ায় কিন্তু কোথাও বসবার জায়গা খুঁজে পায়না সেই জন্য বাবা ঈশ্বরের হাতে এসে বসে। আকাশ থেকে উড়ন্ত ঘোড়া এসে জলে জল পান করবার জন্য আসে। জল পান করবার সময়ে তার মুখ থেকে ফেনা বের হয় জলে। তারপর বাবা ঈশ্বরের কথায় সেই পাখি দুটি সেই ফেনাতে তারা উড়ে গিয়ে বসে। তার সেই ফেনাতে বসে তারা গোটা সমুদ্র চরে বেড়ায় নৌকোর মতো । তারপর তারা বাবা ঈশ্বরের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করে আমরা তো ঘুরে বেড়াই ঠিক আছে কিন্তু খাবার পাই কোথায় ।

তারপর ঠাকুর বা বাবা ঈশ্বর কুমির কে ডেকে পাঠালেন । কুমির এসে বললেন বাবা ঈশ্বর আমাকে ডেকেছেন ? বাবা ঈশ্বর বললেন মাটি আনতে পারবে পাতাল থেকে ? কুমির বললেন আপনি বললে আমি আনতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে কুমির পাতালে গিয়ে পাতাল থেকে মাটি আনতে গেলেন কিন্তু মাটি আনতে আনতে গিয়ে সমস্ত মাটি জলে ধুয়ে জলে মিশে গেলো মাটি আনা আর হল না।

তারপর তিনি ডেকে পাঠালেন চিংড়ি মাছকে। চিংড়ি মাছ এসে বাবা ঈশ্বর কে জিজ্ঞেস করলেন আমাকে ডেকেছেন ? বাবা ঈশ্বর উত্তর দিলেন পাতাল থেকে মাটি আনতে পারবে? চিংড়ি মাছ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন আপনি বললে আনতে পারি বাবা ঈশ্বর। তিনিও জলের নীচে গিয়ে তার শুঁড় দিয়ে মাটি আনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মাটি আনতে গিয়ে দেখেন সমস্ত মাটি জলে ধুয়ে গেলো কিন্তু মাটি আনা আর হল না।

তারপর ঠাকুর বোয়াল মাছকে ডেকে পাঠালেন । তিনি এসে বাবা ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করলেন আমাকে ডেকেছেন ? ঠাকুর তাকে উত্তর দিলেন মাটি আনতে পারবে? আপনি বললে আমি আনতে পারি । তারপর তিনি জলের তলায় গিয়ে মাটি আনতে লাগলেন কিন্তু কিছু মুখে কামড়িয়ে কিছু পিঠে করে আনতে লাগলেন । কিন্তু সমস্ত মাটি জলের সঙ্গে মিশে জলে ধুয়ে গেলো মাটি আনা আর হল না। (সেই থেকে বোয়াল মাছের উপরের চোয়াল নেই)

তারপর বাবা ঈশ্বর বা ঠাকুর কাঁকড়াকে ডেকে পাঠালেন । তিনি এসে জিজ্ঞেস করলেন আমাকে ডেকেছেন ? বাবা ঈশ্বর উত্তর দিলেন জলের তলা থেকে মাটি আনতে পারবে?তিনি উত্তর দিলেন আপনি বললে আমি আনতে পারি । তারপর তিনি তাকে উপদেশ দিলেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে জলের তলায় গিয়ে মাটি আনতে লাগলেন তিনি তার চিমটা দিয়ে মাটি আনতে গিয়ে দেখেন সমস্ত মাটি জলে ধুয়ে জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। মাটি আনা আর হল না।

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research

E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com

Volume 4, Issue 6, November-December 2026

CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i06.1585

তারপর বাবা ঈশ্বর বা ঠাকুর কেঁচোকে ডেকে পাঠালেন। কেঁচো এসে বললেন ঠাকুর আমাকে ডেকেছেন ? ঠাকুর উত্তর দিলেন পাতাল থেকে মাটি তুলে আনতে পারবে ? তিনি বললেন আপনি বললে আমি আনতে পারি। কিন্তু জলের উপরে কচ্ছপ যেন দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপরে কচ্ছপকে ডেকে পাঠালেন । তিনি এসে জিজ্ঞেস করলেন আমাকে কি জন্য ডেকেছেন ঠাকুর? ঠাকুর উত্তর দিলেন জলের তলা থেকে মাটি কেও তুলতে পারল না। কেঁচো মাটি তুলতে রাজী হয়েছেন , আপনি কেবল জলের উপরে দাঁড়িয়ে থাকেন। কচ্ছপ তাকে বললেন আপনি বললে আমি থাকতে পারি । তারপরে তিনি জলের উপরে দাঁড়িয়ে থাকলেন । তিনি জলের উপরে দাঁড়িয়ে থাকলেন ও ঠাকুর চারটি পায়ে শিকল বেঁধে দিলেন যাতে শক্ত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন। তারপরে কেঁচো মাটি তুলার জন্য জলের ভিতরে নামলেন । তার মাথাটা জলের তলায় নামিয়ে তার লেজটা কেঁচোর পিঠে নামিয়ে রাখেন । কেঁচো মাটির নীচে মাটি খাওয়ার পর সেই মাটি লেজদিয়ে কেঁচোর পিঠে পায়খানা করেন। তারপর শেওলার মতো করে কেঁচোর পিঠে জমতে থাকে। মাটি তুলতেই থাকলেন, গোটা পৃথিবী মাটিতে ভরে গেলো। এরপর তিনি থামলেন।

তারপর ঠাকুর সেই মাটিগুলোকে মই দিয়ে সমান করতে বললেন । সমান করার সময়ে কিছু কিছু জায়গায় মাটি গুলো বড়বড় উঁচু ঢিপি তৈরি হল । যেসব জায়গায় সেই ঢিপি গুলো তৈরি হল সেগুলো পাহাড় পর্বত তৈরি হল। তারপর যেসব জলাশয় জায়গায় জলের মধ্যে ফেনার মতো থাকলো সেইসব যায়গায় উলুঘাঁস ছড়িয়ে দিলেন সেই গাছগুলো জন্মালো। তারপরে ঠাকুর ধুবি ঘাঁস (দূর্বা ঘাস), কারাম দারে, শালগাছ, লাবাড় আতনাগ (ছাতিম গাছ), মাতকম (মুহুল গাছ) তার পরে সবরকমের গাছ। গাছপালা তৈরি করার পরে পৃথিবী ধীরে ধীরে শক্ত মাটিতে পরিণত হল । যেসব জায়গায় জল জমে বড় সমুদ্রের মতো তৈরি হল সেইসব যায়গায় শক্ত পাড় দিয়ে বেঁধে দিলেন । তারপরে যেসব জায়গায় ঝরনার মতো করে জল ভিতর থেকে বার হচ্ছে সেইসব যায়গায় বড়বড় পাথরের স্তর দ্বারা পাঁচিলের মতো বেঁধে দিলেন।

তারপর উলুঘাঁসের ঝোঁপে (সিরীম দান্ধি) সেই হাঁস হাঁসলি পাখি বাসা তৈরি করলেন । সেইখানে বাসা বেঁধে পাখিটি দুইটি ডিম পাড়লেন । মা পাখিটি বাসার মধ্যে ডিমের যত্ন নেন আর পুরুষ পাখিটি ঘুরে ঘুরে খাবার খোঁজে। সেইভাবে কিছুদিন পরে সেই ডিম থেকে অবাক করার মতো দুইটি মানুষের বাচ্ছা জন্ম হল, একটা মেয়ে ছেলে, একটা বেটা ছেলে। তারপরে সেই পাখি দুটি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন-

“হায় হায় জালাপুরিরে
হায় হায় নুকিন মানওয়া,
হায় হায় বুসীড় আকানকিন
হায় হায় নুকিন মানওয়া
হায় হায় তকারে দহকিন।

হায় হায় , দো সে লীয়আয়বেন
হায় হায়, মারাঙ ঠাকুর-জীউ,
হায় হায়, বুসীড় আকান কিন
হায় হায় নুকিন মানওয়া

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research

E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com

Volume 4, Issue 6, November-December 2026

CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i06.1585

হায় হায় তকারে দহকিন ।"[৬]

এই গানটি সান্তালি সাহিত্যের লোক সাহিত্য। এই গানের দ্বারা এটাই বলা হয়েছে যে, এখানে হায় হায় কথাটা ব্যাবহার করা হয়েছে । এই 'হায় হায়' কথাটা হচ্ছে দুঃখের ইঙ্গিত করা হচ্ছে। হায় হায় জালাপুরিতে দুইটি মানুষের জন্ম হয়েছে তাদের কোথাই রাখবো তাদের। তাই তারা বাবা ঠাকুরের কাছে জানতে চাইছে তাদের কোথাই রাখা যাই।

তারপর বাবা ঠাকুর সেই পাখি দুইটিকে তুলো দিলেন আর বললেন তোমরা যেটা খাবে সেটার রস বার করে সেটা তুলোতে লাগিয়ে তাদের মুখের কাছে দিয়ে দিন। সেইভাবে তারা খেতে খেতে তারা যখন বড় হল তারা আর তাদের বাসাতে যায়গা হচ্ছে না। তারপর বাবা ঠাকুর সেই পাখি দের বললেন উড়ে উড়ে তারা যেন তাদের জন্য সঠিক যায়গা খুজে পাই। তারা সূর্য অস্ত যাবার দিকে উড়ে যায় । তখন তারা হিহিড়ি পিপিড়ি যায়গা নামে একটি যায়গা খুঁজে পাই । ফিরে এসে তারা সেই যায়গার কথা ঠাকুরকে বলে। তারপর হাঁস হাঁসলি পাখি দুটি তাদের পিঠে চাপিয়ে সেই যায়গায় নিয়ে যাই। তারপর পাখি দুটি সেখান থেকে কোথাই পালিয়ে যাই সেটা জানা নেই।

সেখানে পাখির ডিম ফুটে যে মানুষ জন্ম হয়েছিল তাদের মধ্যে পুরুষ মানুষটির নাম পিলচু হাড়াম আর মহিলাটির নাম পিলচু বুডহি । তারা সেখানে সুমতু বুকুচ ঘাঁস আর সামা ঘাঁসের বীজ খেয়ে বড় হয় । তাদের পরনে কাপড় নেই তুবুও তাদের কোন লজ্জা নেই। তারা অনেক সুখে শান্তিতে বসবাস করেন। একদিন লিটী (ঠাকুরের দুত) এসে তাদের ডাকলেন কোথাই নাতি নাতনিরা কেমন আছো? আমি তোমাদের ঠাকুরদা তোমাদের দেখতে এসেছি। তিনি বললেন দেখছি ভালই আছো । তারপর তাদের কাপড়ের ব্যবহার শুরু করার জন্য একটা মতলব বার করলেন । হীন্ডি (মদ) তৈরি করান জন্য তাদের বললেন। তিনি রানু (বাখর) তৈরি করার জন্য শেখালেন । তিনজন জঙ্গলে গিয়ে তারা সেখান থেকে বাখর তৈরি করার জন্য একটা গাছে শিকড় দেখালেন । সেটা তারা চালের গুড়ি আর সেই শিকড়ের গুড়ো করে সেটাকে একসঙ্গে মিশিয়ে মিস্টির মতো গোল গোল বানায়। তাপর একটা খাঞ্চির মধ্যে খড়ের উপরে রেখে দেয়। তারপর পরের দিন সেখান থেকে বাড় করে একটা হাটাগ (কুলা)তে রেখে রোদে শুকাই । তারপর সুমতু বুকুচ ঘাঁস আর সামা ঘাসের চালের ভাত করে সেটা ঠাণ্ডা করে সেটার সঙ্গে বাখর গুড়ো করে ভালো করে মিশিয়ে পাতার তৈরি বাঁটিতে ঢেকে রেখে দেয়। পাঁচদিন পরে সেটা পাকে । সন্ধে বেলায় লিটী এসে তাদের বললেন সেটাতে কিছুটা জল মিশাও । তারপর লিটী তাদের বললেন (মারাং বুরু চডর আয়তে ঞুয়বেন) দেবতা কে উৎসর্গ করে পান করো । আমি কালকে আবার আসবো তোমাদের দেখতে।

তারপর তারা পাতা দিয়ে তিনটে ফুডুগ(পাতার দিয়ে পাত্র) বানায়। তারপর সেই তিনটে পাত্রে হাঁড়ি(কাচি মদ) রাখে , একটি পাত্রের হাঁড়ি মারাং বুরু নামে উৎসর্গ করে। বাকি দুইটি পাত্রের তারা পান করে। পান করতে করতে হাঁসিমজা করতে শুরু করেন। হাঁসিমজা করতে করতে তারা সমস্ত হাঁড়ি শেষ করে , তাদের অনেক নেশা হয়। রাত্রি হয়, তারা একসাথে শুয়ে পড়ে।

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research

E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com

Volume 4, Issue 6, November-December 2026

CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i06.1585

সকাল হলে লিটী আসে। তাদের ডাকাডাকি করে কোথাই আমার নাতি নাতনিরা ঘুম থেকে উঠেছো কিনা? এসো বেরিয়ে এসো ! তারপর তাদের চেতনা আসে তারা নিজেদের মধ্যে কাপড় তো পরেনি তাদের লজ্জা হলো। তারা তাকে উত্তর দেয় ঘরের ভিতর থেকে। এ গড়ম বাবা আমার কি করে বেরবো আমাদের অনেক লজ্জা লাগছে। আমাদের তো পরনে কিছু নেই। আমরা রাত্রে হাঁড়ি খেয়ে কি যেন একটা বড় ভুল করে ফেলেছি।

তারপর লিটী তাদের বললেন কিছু হবে না। তারপর লিটী মুচকি হেঁসে সেখান থেকে ফিরে গেলেন। তারপর পিলচু হাড়াম আর পিলচু বুড়হি তাদের লজ্জা ঢাকবার জন্য পেকুড় গাছের পাতা দিয়ে কাপড়ের মতো বানিয়ে পরলেন। তারপর তাদের একে একে সাতটি ছেলে সাতটি মেয়ে হয়। এদের বংশধর থেকে সাঁওতাল সমাজে মানুষের জন্ম হয়। সাঁওতাল সমাজের এই পৃথিবী সৃষ্টি ও মানুষ সৃষ্টির কথা অন্য পুস্তকে একটু আলাদা ভাবে লেখা হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকটা মিল রয়েছে। এতে শুধু "হড়করেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা" নিয়ে লেখা হয়েছে।

উপসংহার :-

সাঁওতালি সাহিত্যে পৃথিবী ও মানুষ সৃষ্টের ধারনা সাঁওতাল সমাজের মানুষের প্রাচীন বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জীবনদর্শন ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের গভীর সম্পর্কের পরিচয়। সাঁওতাল সমাজের মৌখিক ঐতিহ্যে সংরক্ষিত সৃষ্টি কাহিনিগুলি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষের কাছে পৌঁছে এসেছে। এই কাহিনি দ্বারা প্রকৃতি, পৃথিবী, জীবজগৎ এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সাঁওতাল সমাজের জীবনচেতনা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায় / *হড়করেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা* পুস্তকটি সাঁওতালি সাহিত্যের অন্তর্নিহিত জ্ঞানভান্ডারকে চিহ্নিত করতে এবং তার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে। অতএব, সাঁওতালি সাহিত্যে পৃথিবী ও মানুষ সৃষ্টির ধারণার অধ্যয়ন কেবল একটি প্রাচীন সৃষ্টিকাহিনির সাহিত্যিক বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি সাঁওতাল সমাজের ঐতিহাসিক স্মৃতি, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং জীবনদর্শন অনুধাবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

তথ্যসূত্র :-

১) টুডু, ড.কৃষ্ণচন্দ্র, সান্তাড়ি পৌরশি উনুরুম, আদিবাসী শোধ কেন্দ্র, ২০২১, পৃ. ১
২) হেমব্রম, পরিমল,সাঁওতালি সাহিত্যের ইতিহাস, নির্মল বুক এজেন্সি, পৃ. ১৬
৩) হেমব্রম, পরিমল,সাঁওতালি সাহিত্যের ইতিহাস, নির্মল বুক এজেন্সি, , পৃ-১৭
৪) টুডু, ড. কৃষ্ণচন্দ্র, সান্তালি সাওহেদ রেয়াগ অনরম আর হারা, প্রফেঃ কৃষ্ণা কুঠির, পৃ. ২
৫) হেমব্রম,পরিমল, সাঁওতালি সাহিত্যের ইতিহাস, নির্মল বুক এজেন্সি, পৃ. ১০৫
৬) স্ক্রেফ্সরুড, রেভারেন্ড এল ও, হড়করেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা, পৃ. ৪

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research

E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com

Volume 4, Issue 6, November-December 2026

CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i06.1585